বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের রূপান্তর

ডঃ মর্তুজা খালেদ, দক্ষিন কোরিয়া

আগের সংখ্যাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন - - - -

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল (১৮১৭-১৮৫৭) ছিল ইংরেজী শিক্ষা সম্প্রসারণের যুগ। ১৯১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলায় প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া ১৮১৮ সালে কলিকাতায় পাঠশালার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ১৮৩৫ সালের মধ্যে কলিকাতায় ইংরেজীসহ পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য আরও ২৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।[৪] এসকল স্কুলের মধ্যে ডাফ স্কুল, চার্চ মিশনারী স্কুল, অরিয়েন্টাল স্কুল, হিন্দু অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হুগলী,ঢাকা,কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ শতকের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৫৩ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ও ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশে প্রভূতপূর্ব অবদান রাখে।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী সমাজ পাশ্চাত্য সমাজ, তাঁর দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। ইউরোপের উদারতাবাদী লেখক বেকন, হিউম, পেইন প্রভৃতিদের লেখনী ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় সমাজ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্ন তোলে জীবন ও ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অর্জিত নতুন পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ভেঙ্গে ফেলে বিদ্যামান বাঙালী সমাজের হাজার বছরের সংস্কার। পাশ্চাত্য দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন, আইজ্যাক নিউটন, জেরমি বেন্থাম, টমাস পেইন, আগাস্ট ক্যোত, চার্লস ডারউইন, জন স্টুয়ার্ড মিল অধ্যয়ন করে বাঙালী সমাজ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সংস্কার মুক্ত এক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য যে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠে তা বেঙ্গল রেঁনেসা বা বাংলার নবজাগরণ হিসেবে অভিহিত হয়। এই নবজাগরণ অন্যতম কর্ণধার ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ইয়ং বেঙ্গল দল।

ইয়ং বেঙ্গল দলের আচরণ ও কর্মে সমসাময়িক বাঙালী সমাজের আচরণ থেকে খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। অবশ্য একথা এখানে বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন যে, হেনরী ডিরোজিও ও তার ছাত্রদের এই সংগঠন অত্যন্ত অগ্রসর চিন্তা চেতনার অধিকারী ছিল। এ দলের সদস্য কাশীপ্রসাদ ১৮৩০ সালেই দেশাত্মবোধক মনোভাবাপন্ন ইংরেজী কবিতা লিখেন। এই পরবর্তী দশকে *Hindu Pioreer* পত্রিকায় বিদেশী শাসনের অধীন ভারতবর্ষ নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর লেখা ও বিভিন্ন কার্যকলাপে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের ষাটের দশকে একাধিক বাঙালী পত্রিকা প্রকাশের সাথে জড়িত হয় এসকল পত্রিকার মধ্যে *Reformer, Bengal Hurkaru, Bengal Chronicle, Parthenon, Bengal Spectator, Hundu Pioneer* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরও পরে প্রতিষ্ঠিত হয় Indian League ও ১৮৭৬ সালে *Indian Association*। এসকল পত্রিকায় খানিকটা দেশপ্রেমমূলক লেখা ও ইংরেজ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে যে নিন্দামূলক কিছু থাকলে তার জবাব দেওয়া হতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় রক্ষা ও ব্রিটিশ সরকারের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করার জন্য বাংলাতে অনেকগুলি সংগঠন গঠিত হয়। এ সবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল *Landholders' Society,Bengal British India Society, British Indian Association* ছিল প্রধান। একইভাবে ১৮৫৬ সালে

মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে *Muhammadan Association of Calcutta*। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এক প্রস্তাবে মুসলমান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়। এভাবে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু বাঙালী সমাজের মধ্যে যে স্বদেশানুরাগের মনোভাবের লক্ষণ দেখা যায় তা এ শতকের শেষভাগে এসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

উনিশ শতকের শেষাংশে এসে বাঙালী হিন্দু সমাজের দেশপ্রেমের ধারণা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ছাড়াও বস্তুগত আধুনিকায়নের যে ধারা ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেখা দেয় তাও দায়ী ছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে রেল ব্যবস্থার বিকাশ ঘটা শুরু হয় এবং অচিরেই তা বিস্তৃত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করে। এ ছাড়া টেলিগ্রাফ ও পোস্ট অফিসও ভারতীয়দের সংহবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের মানুষকে কাছাকাছি আনে। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক ভারতে সাধারণ ভাষা হিসেবে ইংরেজীর বিকাশ ঘটে এবং তা ভারতীয়দের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষার দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান দূর হয়। একই ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা ও ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একই প্রকার সমস্যার সন্মুখীন হয়, অভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধানের অভিন্ন প্রয়াস উপমহাদেশের অধিবাসীদের ঐক্যের মনোভাব তীব্র করে। ওহাবী আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য মনোভাব তীব্র করে।

অপরদিকে উনিশ শতকের শেষার্ধে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমান সংস্কৃত সাহিত্য আবিস্কৃত হয়। ইউরোপীয় মনীষীগণ প্রাচীন হিন্দুর সাথে ইউরোপীয় জাতির জ্ঞাতিত্ব আবিস্কার করেন। একই সাথে বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে প্রাচীন হিন্দু যে এক সময় মানব জাতির শিক্ষাগুরুর পদে অধিষ্ঠিত ছিল তা প্রকাশ করেন। একইভাবে এই সময় ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আবিস্কৃত হতে থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন মন্দির, দেবমূর্তি, ভাস্কর্য প্রভৃতি আবিস্কারের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মহিমান্বিত রূপ প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal নামে একটি সংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন। একইভাবে ১৮৭৬ সালে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-তে "স্বদেশানুরাগ" নামের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। এ প্রবন্ধে লিখা হয়,

> প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে ইহা এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রশংসা-সূচক বক্তৃতা হইলে তাহারা উৎসাহে উন্মক্ত হইয়া উঠেন।[ii]

এ ছাড়া এ সময় ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সময়ে কোলকাতা শহরে স্বদেশী মেলা হতো। এ সকল মেলায় দেশীয় জিনিষের প্রদশনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে বাঙালীদের মধ্যে দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা হতো। এ মেলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, " মেলায় দেশের স্তবগান, গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।"[iii] এভাবে দেখা যায় যে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদীবাদী মনোভাব বৃদ্ধির জন্য এ সময় বাঙালী হিন্দুগণ পুরাতন ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে উদাহরণ টানতে সচেষ্ট হন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে লিখেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।"[iv] একই সময় কবি রঙ্গলাল রচনা করেন দেশাত্মমূলক কবিতা তার কয়েকটি চরণ ছিল নিম্নরূপ

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
> কে বাঁচিতে চায়।

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

একই সময় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত বিলাপ" "ভারত সঙ্গীত" প্রভৃতি বহু কবিতা বাঙালীদের মনে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বীজ বপন করে। তার কবিতার কয়টি পংক্তি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত হতো।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।।

এভাবে দেখা যায় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীবনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র তাদের লেখনীর মাধ্যমে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগ্রত করেন। যদিও তাদের এই সকল রচনা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে রচিত।

এই অবস্থায় ১৮৮৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ইলবার্ট প্রণয়ন করেন ইলবার্ট বিল। এ আইনে ভারতীয় সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট কোন ইংরেজ অপরাধীর বিচার করতে পারবে না। এ আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনজীবীগণ প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। ভারতীয় আইনজীবীদের এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কারণ উপমহাদেশের সকল ইংরেজ এই আইন চালু রাখার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ইলবার্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় আইনজীবীদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করে। এই অবস্থায় ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের ব্যানারে কয়েক বছর ধরে ভারতীয়গণ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করেন ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অচিরেই ভারতীয় মাত্রই উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের নীতি কোন কার্যকরী ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে না।

উনিশ শতকে শেষে এসে ভারতীয় সমাজের সবচাইতে সংস্কৃতিগত দিক থেকে অগ্রসর শ্রেণী বাঙালী মধ্যবিত্তগণ ব্রিটিশ শাসন ও শাসকদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্রিটিশ সরকার যে আন্তরিক নয় তা বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপলব্ধি করে। ফলে বিশ শতকের প্রথমেই পত্র পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙালী মাত্রই উপলব্ধি করেন যে তারা কোন জনকল্যাণকামী শাসকদের দ্বারা শাসিত হচ্ছেন না বরং তারা এক ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা আছেন। পাশাপাশি এ সময় বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বদেশ ও নিজ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। বিদেশী নয় স্বদেশে প্রস্তুত পণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর "স্বদেশী ভান্ডার" নামে দেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ সময় *আত্মশক্তি* নামে একটি প্রবন্ধ সংকলনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে বিদেশী শাসক সরকারের উপর নির্ভর না করে নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভর হবার বিষয়ে নানা পরামর্শ প্রদান করেন। দুর্বল ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী বাঙালী নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় শৌর্যে ও বীর্যে বাঙালীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রথমে কোলকাতায় নানাস্থানে শারিরীক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আখড়া স্থাপন করেন। সেখানে ডন, বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামের মাধ্যমে শক্তিশালী শরীর তৈরীর কৌশল শেখানো হতো। এ ধরনের আখড়া ক্রমান্বয়ে সারা বাংলায় বিস্তৃত হয়।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯০৩ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে অন্তত তিন হাজার জনসভা করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। তার পরও বাঙালীদের আকাঙ্খার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় বাঙালী মাত্রই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। বঙ্গভঙ্গের বিরদ্ধে ক্ষোভ হিসেবে বাঙালীগণ বিদেশী পণ্য, কালো পোষাক পরিধান, নগ্নপদে চলাফেরা করা প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে যে দেশাত্মবোধমূলক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় সে আবেগ পুষ্ট হয় সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করার মাধ্যমে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকারীগণ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ থেকে 'বন্দে মাতরম্' গানটি সংগ্রহ করে

যা পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে সকর গান রচনা করেন তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে এখনও বিবেচিত হচ্ছে। বরীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রচনা করেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোময় ভালবাসি" গান যা বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীত। এ ছাড়া তিনি এ সময় রচনা করেন, "বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য আমার দেশ" ও "বাংলার মাটি বাংলার জল, পুণ্য হউক হে ভগবান" সঙ্গীতটিও এ সময় রচনা করেন । ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনকে রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখিবন্ধনের প্রস্তাব করেন। এ দিন শোকের চিহ্ন স্বরূপ সকল বাঙালীকে উপবাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কোলকাতা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি শোভাযাত্রা করে গঙ্গাতীরে সমবেত হন।

এভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের যে আন্দোলন সারা বাংলায় বিস্ণৃত হয় তা বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগের এক অপূর্ব নির্দশন। বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বদেশপ্রীতির অংশ হিসাবে আরও শুরু করেছিল দুইটি আন্দোলন। একটি ছিল স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বর্জন আন্দোলন এবং দেশীয় শিল্পপণ্য ব্যবহার করা। অরবিন্দু ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শান্তিনিকেতনকে দেশীয় রীতির এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল সহিংস সন্ত্রাসী আন্দোলন। শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে অপসারণ স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠন করা। এই সন্ত্রাসী আন্দোলনের প্রথম বলি হন ক্ষুদিরাম। তাকে ১৯০৮ সালে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। পুরো দুই দশক ধরে চলে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের শেষ অধ্যায় ছিল ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ।

এভাবে দেখা যায় উনিশ শতকের উত্থিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের স্বার্থপরতা সর্বজনখ্যাত ছিল। যারা আত্মকেন্দ্রীকতা, শ্রমবিমুখতার জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙালী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের যে ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তার চূড়ান্ত বর্হিপ্রকাশ দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময়। উনিশ শতকের স্বার্থপর বাঙালী মধ্যবিত্ত বিশ শতকে এসে দেশপ্রেমিক এক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের এই অবস্থান বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি। বিশ শতকে দ্বিতীয় শতক থেকে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলার রাজনীতিতে অভ্যুদয় ঘটে, এই শতকের ত্রিশের শতকে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হলে বাংলার রাজনীতিতে আবারও পরিবর্তনের ধারা সূচীত হয়। অবশ্য এই পরিবর্তনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত ছিল বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের। ১৯৪৭ সালের দ্বিতীয় বাংলা বিভক্তির মূল কারণ ছিল উদীয়মান বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক মেনে নিতে অস্বীকার করা।

(আগামী সংখ্যায় বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।)

---

[i] *H*, c„123|
[ii] *H*, c„ 527|
[iii] kx iex›`bv_ VvKż, *Rxeb¯§wZ*, c„ 146|
[iv] ew¼gP›` P‡Ævcva¨vq, Òev½vjvi BwZnvm m¤‡× K‡qKwU K_vÓ ew¼g iPbvejx ,*c‡ev³*, c„337|

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এই তরুন লেখকের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন